জাতীয় শ্রমনীতি ২০১০
(National Labour Policy 2010)
(খসড়া)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	৩
২. বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার, অর্থনীতি ও বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষিতে শ্রম ও শিল্পে পরিবর্তন	৪
৩. রূপকল্প ২০২১	৪
৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫
৫. শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন	৫
৬. শিল্প সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন	৯
৭. শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য	১১
৮. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ	১১
৯. নারী শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্রে সমতা	১২
১০. শিশুশ্রম নিরসন	১২
১১. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক	১২
১২. করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি	১৩
১৩. সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ডের সমন্বয়	১৩
১৪. শ্রম আইনের সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ	১৩
১৫. অন্যান্য নীতির সাথে সম্পৃক্ততা	১৩
১৬. নীতি বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট	১৩
১৭. শ্রমনীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	১৪
১৮. উপসংহার	১৪

জাতীয় শ্রমনীতি ২০১০

১.০০. ভূমিকা:

১.০১. মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা:

স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির মাধ্যমে একটি মর্যাদা সম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী স্বৈরশাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক সংগ্রামসমূহে সর্বস্তরের জনগণের সাথে শ্রমজীবী মানুষ এক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নেও শ্রমজীবী মানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভুমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও মালিক-শ্রমিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যাশার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং শোষণ দারিদ্র কুসংস্কারমুক্ত সৃজনশীল ও কর্মমুখর শ্রমজীবি সমাজ গঠন।

জনজীবনের ন্যুনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান ও সেবামূলক কার্যাবলী বৃদ্ধির জন্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্যে। কেননা দেশের প্রতিটি নাগরিক যখন উন্নয়নের সুফল ভোগ করে তখনই সার্বিক উন্নতি অর্থবহ হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে সরকার এমন একটি ইতিবাচক, বাস্তবমুখী এবং ন্যায়সংগত নীতি অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর যার ফলে শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাবেন। এই সংগে সরকার আশা পোষণ করে যে, শ্রমিকরাও সাধ্যানুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করবে। এই ব্যবস্থাতেই মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আইন ও ন্যায়সংগত অধিকার ও দায়িত্ব সুসংহত হবে।

১.০২. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় নিম্নোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে তাগিদ দিয়েছে:

"কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি, নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতানুসারে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপ, সরকারী নিয়োগে সুযোগের সমতা, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা" ।

১.০৩. আর্ন্তজাতিক শ্রম মান, অন্যান্য সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার:

আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রম মানসমূহ এবং ঘোষণাসমূহের প্রতি সম্মান দেখাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর অন্যতম হলো ঐতিহাসিক ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা, যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে 'পৃথিবীর যে কোন স্থানের দারিদ্র সকলের জন্যই হুমকি এবং সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা সকলের অধিকার'। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আই এল ও কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে অধিকারের নীতিসমূহ ঘোষণা করা হয়। উক্ত ঘোষণার আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় সরকার সচেষ্ট হবে।

১.০৪. পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাঃ

স্বাধীনতাপূর্বকালে দেশে কোনো কল্যাণমুখী শ্রমনীতি ছিলনা। ইস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময় প্রণীত বিধি-বিধানের ভিত্তিতেই তাই দীর্ঘকাল এদেশের শ্রম বলয় শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনকের নির্দেশক্রমে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম প্রণীত হয় দেশের শ্রমনীতি। সেই শ্রমনীতিতেই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পে শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ শ্রমনীতি ১৯৮০ সালে প্রণীত হওয়ার পর বিগত ৩০ বছরে শ্রম ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে:

১. বেসরকারি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দ্রুত বিকাশ;
২. নিয়োগ ও চাকরির ধরন পরিবর্তন;
৩. বহুজাতিক কোম্পানির উপস্থিতি ও বিদেশী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি;
৪. আর্ন্তজাতিক শ্রমমান, মানবাধিকার মানদণ্ডে নতুন সংযোজন ও শোভন কাজের জন্য আর্ন্তজাতিক প্রচারণা (ক্যাম্পেইন) এবং তাতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ;
৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং এ প্রক্রিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ;
৬. শ্রমবাজারে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ;
৭. রপ্তানীমুখী শিল্পের ব্যাপক প্রসার এবং ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতাসহ অন্যান্য আন্ত-র্জাতিক মানবাধিকার ধারণার বিস্তার।

তাছাড়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির কাছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহার তথা দিন বদলের সনদ জাতীয় শ্রমনীতি পুনমূল্যায়ন ও সংশোধনের অঙ্গীকার ও ঘোষনার প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে সরকার যুগোপযোগী এই শ্রমনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

২.০০. বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষিতে শ্রম ও শিল্পে পরিবর্তনঃ

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব অপরাপর দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও বিরাজমান। আশির দশক থেকেই এ দেশের শিল্পখাতে উদারিকরণ নীতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বেসরকারিকরণ, দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহের বাধ্যবাধকতার কারণে শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহকে শিথিল করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক স্বার্থে ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে "কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার" শীর্ষক নিম্নোক্ত ঘোষণা/ নীতিমালা ঘোষণা করে :

১. সকল প্রকার বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ;
২. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন;
৩. সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং
৪. শিশুশ্রমের কার্যকর বিলোপ সাধন।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ ও বাস্তবতায় উপর্যুক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

৩.০০. রূপকল্প ২০২১:

এই নীতি সরকারের রূপকল্প ২০২১ বর্ণিত শ্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে:

৩.০১. উৎপাদন ও সেবাধর্মী শিল্প খাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার;

৩.০২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস;

৩.০৩. শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং

৩.০৪. প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনশক্তির বিকাশ ।

৪.০০. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৪.১ লক্ষ্য :

বিনিয়োগসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনশীল, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ।

৪.২. উদ্দেশ্য:

১. সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত জনশক্তি তৈরী এবং কর্মক্ষম সকল নাগরিকের জন্য যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি;

২. জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বর্হিবিশ্বের চাহিদা মেটাতে সক্ষম শ্রমবাজার তৈরী ও ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ;

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা;

৪. শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন;

৬. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের উন্নয়ন;

৭. কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ;

৮. দলিত, আদিবাসী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং ভাসমান মানুষসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

৯. সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং

১০. শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রশাসনকে আধুনিক, যুগোপযোগী, জনকল্যাণমুখী, সেবাধর্মী ও কার্যকর করা ।

৫.০০. শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের জীবন-মান উন্নয়ন:

শ্রমিকের শ্রম মানব সভ্যতার জনক,-এই মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সরকার শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

৫.০১. কর্মসংস্থান ও কাজের নিশ্চয়তা:

সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;

১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান;
২. চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি;
৩. চাকরিপ্রার্থী ও চাকরির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রচার করা;
৪. চাকরিরত সকল শ্রমিকের সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডাটাবেজ ডিজিট্যালাইজড পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ ও তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা ;
৫. শিক্ষানবিশির সুযোগ বৃদ্ধি;
৬. বিভিন্ন পেশাকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সনদের ব্যবস্থা;
৭. গবেষণার মাধ্যমে কাজের সম্ভাব্য সুযোগসমূহকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
৮. কাজের নিশ্চয়তা বিধান ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৯. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান এবং
১০. শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও গ্রামীণ এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান।

সরকার শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা বিধান করবে এবং কর্মহীনতা সৃষ্টি করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যেন না হয় সে বিষয়ে সক্রিয় থাকবে।

৫.০২. শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন:

কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং চাকরির নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাব্য শ্রমিক ও বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, বিকল্প প্রশিক্ষণ, পুন:প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যত চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সরকার বিএমইটিসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আধুনিকায়ন ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মান নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট থাকবে। সে লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকৃত শিল্পে দেশীয় শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং শ্রমিকগণ যেন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করতে ও ডিগ্রি অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দক্ষতা উন্নয়নে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষাধীনতা বিষয়ক আইনকে যুগোপযোগী, বাস্ত বায়ন ও সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর ধারাকে অব্যাহত রাখা ও বিস্তৃত করা। এক্ষেত্রে তরুণদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শিক্ষাধীন কার্যক্রমসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান ও আইনের আওতায় আনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিদেশের শ্রমবাজারে আরো অধিক হারে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন প্রযুক্তিবিশেষ করে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। তাছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে প্রশিক্ষক তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০০. শোভন কাজঃ

বাংলাদেশ আইএলও'র সদস্য হিসেবে আইএলও'র শোভন কাজ কর্মসূচির দৃঢ় সমর্থক ও সক্রিয় অংশীদার যার মূল কথা হচ্ছে কর্মক্ষম সকল নারী ও পুরুষের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে চলমান বিভিন্ন কর্মসূচিতে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে সরকার শোভন কাজের মানদণ্ডসমূহকে জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং

১. চমৎকার কর্মপরিবেশের সফল উদাহরণসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরবে;
২. শোভন কাজের উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
৩. ব্যাংক ঋণ প্রদান করবে;
৪. কর রেয়াত প্রদান করবে;
৫. লাইসেন্স প্রদান করবে;
৬. আমদানি সহজিকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোভন কাজের মানদণ্ডকে শর্তাধীন করবে।

৭.০০. ন্যায্য মজুরি :

সরকার শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য জীবন ধারণ উপযোগী ও ক্রমাগত জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যার মধ্যে অন্যতম হবে:

১. নিম্নতম মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ;
২. দ্রব্য মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনা;
৩. শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের মজুরি নির্ধারণ;
৪. নারী-পুরুষ ও দেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মজুরির সমতা নিশ্চিত করা এবং
৫. পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী ও অবহেলিত অঞ্চলে ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সরকার বিশ্বাস করে যে, ন্যায্য মজুরি ও মজুরির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে এবং কাজে আত্মনিয়োগের জন্য শ্রমিককে আগ্রহী করে তুলবে।

মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। মজুরির সাথে উৎপাদনশীলতার সংযোগ সাধন, সামগ্রিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, ব্যবসার বিকাশ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং শ্রমিকের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মূল মজুরির অতিরিক্ত সকল প্রাপ্তিকেই উৎপাদনশীলতার স্তরের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

৮.০০. উৎপাদনশীলতা ও লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশগ্রহণঃ

সরকার বিশ্বাস করে যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল উৎপাদনের সাথে জড়িত মালিক ও শ্রমিকের জন্য বর্ধিত উৎপাদন ও লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। সঠিক উৎসাহদান ব্যবস্থা

অধিকতর উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল পক্ষ অর্থাৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক এবং ক্রেতা তথা ভোক্তা সাধারণকে সমভাবে পরিতৃপ্ত রাখতে সক্ষম। সুতরাং, এ লক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট আইনকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে যুগোপযোগী করবে। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হবে:

১. জনশক্তি, মালামাল, কলাকৌশল, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ফলপ্রসূ ব্যবহার;
২. উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, অপচয় রোধ এবং দ্রব্যের মানোন্নয়ন;
৩. উৎপাদনের লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন তথা সামগ্রিক কল্যাণ সাধন;
৪. উন্নততর শিল্প সম্পর্ক, শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনা বিকাশ;
৫. প্রতিষ্ঠানের লাভ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক, মালিক ও সমগ্র জাতির উন্নতিসাধন;
৬. উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথোপযুক্ত উৎসাহপ্রদান কর্মসূচি প্রণয়ন।
৭. দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন নতুন শিল্পের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও পুন: প্রশিক্ষণ।

৯.০০. শ্রম কল্যাণ:

রাষ্ট্রের বিদ্যমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সুফল সাধারণ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ প্রেক্ষিতে শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশনকে সক্রিয় করা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ এবং উক্ত ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট থাকবে। সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোক্তাগণও শ্রমিকের কল্যাণে, বিশেষ করে শ্রমিকের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সরকার এক্ষেত্রে আইনী ও উৎসাহমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। অঞ্চলভিত্তিক ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণ একত্রিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

সরকার রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন কল্যাণমূলক স্কিমে শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত, শিল্পায়নের কারণে চাকরিচ্যুত/ কর্মচ্যুত শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে যাতে কর্মক্ষম জাতি গঠনে এ ধরনের জনশক্তির উপযোগিতা ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

১০.০০. স্বাস্থ্য:

শ্রমিকের স্বাস্থ্য দেশের সম্পদ। সরকার বিশ্বাস করে যে, একজন সবল শ্রমিক নিজের ও পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাই শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সরকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি শিল্প কারখানায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ শ্রমিকের যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে, বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের সংস্কার সাধন করে সেবার মান বৃদ্ধি করবে ও প্রত্যেক কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে। শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকের জন্য সরকারি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে উদ্যোক্তা ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবে। যে সকল শিল্পাঞ্চলে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নেই সেই সকল শিল্পাঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবাসহ নতুন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করবে। প্রত্যেক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নারীর জন্য

মাতৃত্বকালীন চিকিৎসাসেবা ও শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারি হাসপাতালসমূহে পেশাগত রোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগসমূহে সান্ধ্যকালীন শিফ্‌ট চালু করবে। সরকার শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সরকার সকল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এবং শ্রমঘন এলাকায় অবস্থিত হাসপাতালসমূহে জোরালো পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সরকার শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে। সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

১১.০০. সামাজিক নিরাপত্তাঃ

শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সংবিধানের মূলনীতির অংশ। সরকার উক্ত দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সরকারি - বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচ্যুইটি ও অবসরকালীন ভাতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনের সংস্কার ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। সরকার অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কল্যাণে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশনের আওতায় নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করবে-

১. দুর্ঘটনায় আহত বা পেশাগত অসুস্থতায় কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ আইন
যুগোপযোগী করা এবং সকল শ্রমিকের জন্য এ আইন ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ;

২. পেশাগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অথচ কর্মক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিকল্প প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য সহযোগিতা নিশ্চিত করা;

৩. নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় একটি অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা ও সে লক্ষ্যে সকল প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী-অস্থায়ী সকল ধরনের নারী শ্রমিকের জন্য বেতনসহ প্রসূতিকালীন ছুটি ও ছুটি শেষে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের জন্য সরকারের মাতৃত্ব সুরক্ষা স্কিমের আওতায় শ্রমজীবী নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের বার্ধক্যকালীন সুরক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন স্কিমে তাদের প্রবেশাগম্যতা নিশ্চিত করা।

৬. সরকারের সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি, বাণিজ্য চুক্তি প্রভৃতি কারণে শিল্প বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ বা স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

৭. শ্রমিকের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, অবসর ও অনাকাঙ্খিত বেকারত্বের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্দ্যোগে স্বল্পমূল্যে সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করা। এই স্কিমে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্বকে সরকার উৎসাহিত করবে।

৮. প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য বছরের ন্যুনতম সংখ্যক দিন কাজ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২.০০. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাঃ

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র শ্রমিকের জীবন ও শিল্পের নিরাপত্তা উভয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি। "সবার আগে নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ" যা পুনর্বাসনের চেয়ে উত্তম এবং কম ব্যয়বহুল। এই নীতির ভিত্তিতে সরকার শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ ইস্যুর গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি পৃথক নীতিমালার আওতায় পরিচালনা করতে

হবে। উক্ত নীতিমালার আলোকে শ্রম আইনের সংশোধন, বাস্তবায়ন, পরিবর্ধন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য আইন, নীতিমালা, বিধির সমন্বয় সাধন ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ ও শ্রমিকের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে নিয়মিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করবে।

১৩.০০. শিল্প সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়নঃ

০১. ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপঃ

শিল্পে স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং বৃহত্তর পরিসরে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ট্রেড ইউনিয়ন সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সংবিধান ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার শ্রমিকের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার অধিকার নিশ্চিত করায় বিশ্বাস করে এবং এ লক্ষ্যে আইএলও কনভেনশনের আলোকে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করবে।

০২. সরকার আরো বিশ্বাস করে যে, স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিক কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শান্তি রক্ষা ও শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিনিধিত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন চর্চায় বাধাসমূহ দূরীকরণে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩. সরকার সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক সংলাপকে উৎসাহিত করবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও জাতীয় পর্যায়ে দর কষাকষি ও নিয়মিত সংলাপ চর্চায় বিদ্যমান কাঠামোসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করবে।

১৪.০০. অংশগ্রহণ কমিটিঃ

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও সংলাপের কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত করতে সরকার ভূমিকা রাখবে। শ্রমিক কল্যাণ, শোভন কর্মপরিবেশ, শ্রম আইনের বাস্তবায়ন ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করায় শ্রমিকগণ যাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রম আইনে অংশগ্রহণ কমিটি গঠনের বিধান থাকা বাঞ্চনীয়। সরকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও এর কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫.০০. বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

০১. সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে বিরোধ উদ্ভব না হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অনুযোগ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। কোথাও শিল্প বিরোধ উদ্ভবের ক্ষেত্রে তার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যৌথ আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার, নিষ্পত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে সরকার উৎসাহিত করবে। সরকার অসৎ শ্রম আচরণকে নিরুৎসাহিত করবে এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিশী কার্যক্রম শক্তিশালী করবে।

০২.আইনের আশ্রয় লাভ ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শ্রম আদালতের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে এবং শ্রমিকদের আইনী সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

০৩. সরকার মামলার বিস্তার ও শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা রোধ এবং বিরোধের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিচারাধীন বিষয়সমূহ আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করার জন্য "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি" প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে ।

১৬.০০. ত্রিপক্ষীয়তা:

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ত্রিপক্ষীয়তা কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। বর্তমান শ্রমনীতির অন্যতম ভিত্তি এই ত্রিপক্ষীয় নীতিমালার প্রতিফলন। শ্রম সংক্রান্ত নীতি, আইন প্রণয়ন ও সংশোধনে সরকার এই ত্রিপক্ষীয় নীতি অনুসরণ করবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠন এবং ত্রিপক্ষীয় কাঠামোসমূহকে জোরদার করতে সচেষ্ট হবে ।

১৭.০০. শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য:

দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের একটি অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে গণ্য। কর্মক্ষম ও সম্ভাব্য চাকরিপ্রার্থী ব্যক্তির চাকরির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যেমে কাজের সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা ও এক্ষেত্রে নাগরিকের অসুবিধা তথা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে। এর পাশাপাশি দেশের অভিজ্ঞ, বিশেষ করে প্রত্যাবাসী অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা কাজে লাগানোর একটি সুযোগও সৃষ্টি হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকার একটি তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করবে। ফলে দেশের যেসব ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকগণ কর্মরত সেসব স্থানেও দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। একটি স্থায়ী গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভাব্য কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ চিহ্নিত করে তার ব্যাপক প্রচার ও তা তথ্য ভাণ্ডারে জমা রাখার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

১৮.০০. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ :

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সরকার আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে নিরাপদ ও গতিশীল করার জন্য শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি ও আইন যুগোপযোগীকরণ, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, শ্রম তথ্যভান্ডার তৈরী ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেসব কাজ করবে:

১. শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করবে এবং বৈধভাবে অভিবাসন মনিটরিং সংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান ।
২. শ্রম অভিবাসনের বর্তমান বাজার ধরে রাখার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে শ্রমিক স্বার্থ-সংশিষ্ট দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন। এছাড়া নতুন নতুন শ্রমবাজার তৈরী করার জন্য জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন ।
৩. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে যাতে এ ক্ষেত্রে পূর্ণ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয় ।
৪. প্রতারিত অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায় ও আইনী সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন ।

৫. শ্রম গ্রহণকারী দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশী দুতাবাসসমূহ অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় এবং নতুন শ্রম বাজার তৈরীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণে প্রযোজনীয় সহযোগিতা করবে। এ ক্ষেত্রে দুতাবাসসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হতে হবে। তাছাড়া শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোকবল এবং অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৬. নারী অভিবাসন খাতটি যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হওয়ার কারণে এই প্রক্রিয়াকে নিরাপদ করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে নারীর নিরাপদ শ্রমবাজার খুঁজে বের করবে এবং দক্ষ নারী শ্রমিক তৈরীতে স্থানীয় পর্যায় থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭. অভিবাসন সংক্রান্ত জনসচেতনতামুলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার ফান্ড এর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং এ প্রক্রিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।

৯. প্রত্যাবাসী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্জিত রেমিটেন্স এবং দক্ষতা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ ।

১০. অভিবাসী শ্রমিকের দেশে অবস্থানরত পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা ও সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন।

১৯.০০. নারী শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্রে সমতা:

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, শ্রমবাজারে নারীর অধিক অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি নারীর জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

দেশের সংবিধান ও স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক সনদসমূহ অনুসরণপূর্বক সরকার কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অংশীদারীত্ব, সমান সুযোগ, সমমর্যাদা এবং সমআচরণ নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করবে। সরকার নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার, অর্থনীতি ও সমাজে অবদান ইত্যাদির সাথে সংগতি রেখে শ্রম আইনে নিয়মিত পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করবে। সরকার দক্ষ ও শিক্ষিত নারী শ্রমশক্তি সৃষ্টি ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার অক্ষম, প্রতিবন্ধী বয়স্ক নারী শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিশেষ দৃষ্টি দেবে।

২০.০০. শিশুশ্রম নিরসন:

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশীদার। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্ল্যেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের হার উদ্বেগজনক। শিশুশ্রম সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য সরকার শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুমোদন করেছে। এই নীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল:

১ শিশুশ্রম এবং শ্রমজীবী শিশুর শ্রেণিবিভাগ

২. শিশুশ্রম বিনিময় মজুরি ও কর্মঘন্টা

৩. শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) ও পুষ্টি

৪. শ্রমজীবী শিশুর কর্ম পরিবেশ

৫. প্রতিবন্ধী, বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত, পথশিশু, অনগ্রসর ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা
৬. শিশুশ্রম নিরসনে বাস্তবভিত্তিক কর্মকৌশল নির্ধারণ
৭. ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা
৮. চাইল্ড লেবার ইউনিট প্রতিষ্ঠা
৯. জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা
১০. বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি কার্যকর করার ব্যবস্থা ।

বর্তমান শ্রমনীতি উক্ত শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং একে অপরকে পরিপূর্ণতা দেবে ।

২১.০০. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক:

বাংলাদেশে বেশিরভাগ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, দিন মজুর, পারিবারিক ব্যবসায় কর্মরত শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, স্বনিয়োজিত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিবহন শ্রমিক ইত্যাদি । এই ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করার মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ । ইতোমধ্যে সরকার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশন আইন ২০০৬ এর আওতাভুক্ত করেছে পাশাপাশি গৃহ শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আচরণনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । বিদ্যমান শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্কিমের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই শ্রম গোষ্ঠির জীবন-মান উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট হবে । এই ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণে সরকার যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী, জাতীয় ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ ও অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

২২.০০. করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সামাজিক দায়বদ্ধতা):

করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর হলো সমাজের প্রতি কোম্পানিসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা । কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের বাইরেও অন্যান্য অংশীদার (স্টেকহোল্ডার) তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে তাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে । সিএসআর হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত উদ্যোগ । সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিসমূহকে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ।

২৩.০০. সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ডের সমন্বয়ঃ

এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থা সমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে । নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি কর্মকান্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে ।

২৪.০০. শ্রম আইনের সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ:

সরকার এই নীতির আলোকে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগগ্রহণ করবে এবং শ্রম বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে শ্রম আইনকে যুগোপযোগী রাখার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকবে ।

২৫.০০. অন্যান্য নীতির সাথে সম্পৃক্ততাঃ

এই শ্রমনীতি দেশে বিদ্যমান ও প্রণীতব্য অন্যান্য নীতির শ্রম ও শিল্প সংশ্লিষ্ট অংশের সম্পূরক হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 'নীতিসমূহ, যেমন : জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০, খসড়া শিল্প নীতি ২০১০, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি ২০১০, পরিবেশ নীতি ইত্যাদি।

২৬.০০ নীতি বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্টঃ

এই নীতি বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্য দপ্তর ও পরিদপ্তরের উপসচিব ও তর্দ্ধুপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা উক্ত দপ্তর ও পরিদপ্তরের ফোকাল পয়েন্ট হবেন। এরুপ নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্টগণ আন্ত ঃযোগাযোগের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং প্রতি তিন মাস পর পর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২৭.০০ শ্রমনীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনাঃ

যথাযথ কর্ম পরিকল্পনা ও সময়সূচি নির্ধারণ করে সরকার এই নীতি বাস্তবায়ন করবে।

২৮.০০ উপসংহারঃ

বাংলাদেশ এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের অংশ। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, বিশ্ব জুড়ে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি ও অর্থনৈতিক জোট গঠন প্রভৃতি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষিতে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ উভয়ই সৃষ্টি করেছে।
সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দ্রুত, টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই শ্রমনীতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা, সম্পর্ক উন্নয়ন ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। এ ছাড়া এই শ্রমনীতি আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন-বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, শোভন কাজ, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

সরকারের রুপকল্প ২০২১ এর সার্থক বাস্তবায়ন, কর্মসংস্থান, শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং শ্রমিকবান্ধব প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই শ্রমনীতি ভূমিকা রাখবে বলে সরকার আশা করে। সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একটি মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে আমাদের স্থান আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দেশের শ্রমজীবী মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, মালিক ও

মালিকের সংগঠনসমূহ, সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এই নীতি বাস্তবায়নে যার যার অবস্থান থেকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করবে ।